।। **নীলদর্পণ (১৮৬০)** ।। নীলের হাঙ্গামা আজ পুরাতন ইতিহাসের বিলীয়মান স্মৃতির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। দেশের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ভগ্নকুঠী এবং লোকপরম্পরায় প্রচলিত কতকগুলি কিংবদন্তী আজ সেই নীলের কাহিনীর জীর্ণ সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে এই নীলের সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি দেশজোড়া জাগরণ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা এক আকস্মিক ভূমিকম্পের মত বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি সজোরে নাড়িয়া দিয়াছিল। বোধ হয় তাহাই হইল আমাদের সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ।

বহুকাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইত। ভারতে উৎপন্ন হইত বলিয়া নীলের নাম হইল Indigo । দিল্লী হইতে ঢাকা পর্যন্ত নীলের চাষ হইত বটে কিন্তু বাংলার নীলই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত এবং ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলার নীলই সারা পৃথিবীর চাহিদা মিটাইত। নীলের চাষ প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল এবং তাহারা ইহা হইতে প্রভূত অর্থলাভ করিয়াছিল, কিন্তু ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এই চাষের ভার তাহাদের কর্মচারী এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের হস্তে অর্পণ করে। ইহারা এই ব্যবসার ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে দেশের চাষী রাইয়তদের দুর্দশা শুরু হয় এবং ক্রমে এই দুর্দশার চরম অবস্থা দেখা দেয়।

নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়া রাইয়তদিগকে নীল বুনিবার চুক্তিতে আবদ্ধ করিত। রাইয়তেরা অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদন লইতে বাধ্য হইত। নীলের চাষে তাহাদের কোনই লাভ ছিল না, কারণ দাদনের টাকা বাকি-বকেয়া প্রভৃতি শোধ করিয়া তাহাদের ভাগ্যে বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকিত না, অথচ দেনা ও ঋণসমেত চুক্তির বোঝা তাহাদিগকে পুরুষাণুক্রমে বহিয়া বেড়াইতে হইত। অসম্মত প্রজাদের নিষ্কৃতির কোনোই পথ ছিল না, কারণ জালজুয়াচুরি, প্রতারণা উৎপীড়ন প্রভৃতি যে কোনো উপায়েই হউক নীলকর সাহেবরা তাহাদের উপর চুক্তির দায়িত্ব চাপাইয়া দিত। অসহায় প্রজাগণ অনাহারে থাকিয়া, সব অত্যাচার সহিয়া নীলের চাষ করিয়া দিত, প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

কিন্তু এই সব সহায়সম্বলহীন প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া বিদেশাগত নীলকর ব্যবসায়ীরা রাজার হালে দিন কাটাইত। নীলের ব্যবসায়ে অপরিমিত অর্থ উপার্জন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিসীম হইয়া উঠিল। স্যার হেনরী কটন নীলকর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'His power in my time was practically unlimited' । জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি অনেক সময় নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। কয়েকটি ইংরাজী

Scanned with CamScanner

সংবাদপত্রও তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা বিনাবাধায় তাহাদের শোষণ ও উৎপীড়ন চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারের বিবরণ পড়িলে আজও লোকের শরীর শিহরিত হইয়া উঠিবে। 'নীলদর্পণ'-এ বর্ণিত একটি কথাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে। যেসব রাইয়ত চাষ করিতে অসম্মত হইত তাহাদের গুলি করিয়া অথবা বর্শাবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত; কিংবা নীচু, সংকীর্ণ অন্ধকার গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নীলকরদের শ্যামচাঁদ অথবা রামকান্ত প্রজাদের পিঠে পড়িবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত এবং সাহেবদের সবুট অভ্যর্থনা প্রজারা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। সময় সময় এক একটা গোটা গ্রাম অথবা বাজার নীলকরদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইত। গৃহস্থকন্যা ও বধূদেরও অব্যাহতি ছিল না। মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া কুঠিতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। ক্ষেত্রমণির প্রতি অত্যাচার-বৃত্তান্ত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

অবশ্য তৎকালীন ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহও যে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই তাহা নহে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন ও কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের ন্যায় কর্মচারীও তখন ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরীহ নিঃসহায় কৃষককুলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম বাঙালীজাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। প্রজাদরদী ছোটলাট স্যার পিটার গ্রান্ট কার্যভার গ্রহণ করিয়াই একটি পরোয়ানা জারি করিলেন যে নীলের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই পরোয়ানা প্রজাদের অসন্তোষের বারুদে আগুন ধরাইয়াছিল। তাহারা বহুদিন নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এতদিন পরে তাহারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই আগুনে ইন্ধন দিয়াছিলেন প্রথম দুইজন গ্রামবাসী—বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। দুর্বল কৃষককুল এতদিন পরে একতার মধ্যে এক মহাশক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিল, বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহাই হইল প্রথম মহাশক্তির উদ্বোধন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সভ্য ছিলেন পাঁচজন এবং সিটনকার ইহার সভাপতি ছিলেন। চার মাস ধরিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া কমিশন রিপোর্ট দিলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারা জোর করিয়া নীলের চাষ করান হয় এবং এই চাষ তাহাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। কমিশন-রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট নীলকর অত্যাচার প্রশমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত নীলকর দমিবার পাত্র নহে। তাহারা গ্রান্ট, ইডেন, হার্সেল, সিটনকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং নানাভাবে ইঁহাদের অপদস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁহারা সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র। হরিশচন্দ্র তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁহার অগ্নিস্রাবী লেখনীকে নিয়োজিত রাখিলেন। শোষিত প্রজাবৃন্দের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া লইলেন। নীলকরগণ এই শত্রুতা ভুলিতে পারে নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার সহায়হীন পরিবারের উপর তাহাদের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা পতিত হইয়াছিল। 'নীলদর্পণ'-এর আঘাত বোধহয় আরো তীব্র ছিল এবং সেজন্য ইহার উপর

Scanned with CamScanner

তাহাদের প্রতিহিংসা আরো বেশী হিংস্র ও পৈশাচিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিয়া মাইকেল সুপ্রিম কোর্টের চাকরি হারাইয়াছিলেন, ইহার প্রকাশ করিয়া পাদরী লং কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রচারের সাহায্য করিয়া সিটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। আজ দেশে নীলের চাষ নাই, নীলকরের অত্যাচার নাই, কিন্তু একদিন ইহাদের লইয়া কত না ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং সেই দুর্যোগ-দিনে যে সব স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ হৃদয় অসহায় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কৃতজ্ঞ জাতির ইতিহাসে চিরকাল তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইহা যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার তুলনা অন্য কোথাও আমরা দেখি নাই। নীলকর-অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যখন নিরুপায় জনসাধারণ দুঃখের অন্ধকারে তাহাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তখন 'নীলদর্পণ' তাহাদের সম্মুখে অগ্নিবর্তিকা জ্বালিয়া ধরিল। সেই অগ্নিতে সেদিন জনগণের প্রথম দীক্ষা হইয়া গেল, সেই অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল দেশের প্রান্ত ও প্রান্তরে। অত্যাচারের লেলিহ জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।' 'নীলদর্পণ'-এ যে বিদ্রোহ-বাণী ধ্বনিত হইল তাহার প্রভাব সাময়িক কালেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহা দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ। সেজন্য তাহার রক্তআখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকখানি নিষ্ঠুর নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া সত্যপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহার প্রকৃত মর্যাদা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লং, সিটনকার প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তি ইংরাজ হইয়াও এই পুস্তকের প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় নাটকখানির সমাদর কত বহুধা-বিস্তৃত হইয়াছিল।

'নীলদর্পণ' বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবতার পথনির্দেশ করিয়াছিল। লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দন-কানন হইতে বিদায় লইয়া বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ সুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাস-হর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের কারুণ্য-কুটিরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণিও তাহাদের দুঃখবেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে। আজ বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রতি যে সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা দিয়াছেন তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে লিখিত এই অবিস্মরণীয় নাটকে। আজিকার সাহিত্যিকদের এবিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন আছে।

'নীলদর্পণ' পরবর্তী সামাজিক নাট্যধারাকে যে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 'নীলদর্পণ'-এর কাহিনীর মূলকেন্দ্র হইল সুখে-শান্তিতে অবস্থিত একটি একান্নবর্তী বাঙালী পরিবার, প্রতিকূল অবস্থার নিষ্ঠুর আবর্তনে যাহা সর্বনাশের অতলতলে ডুবিয়া যায়। এই ধরনের কাহিনী পরবর্তী বহু সামাজিক নাটকে আলোচিত হইয়াছে। করুণ রসাত্মক নাটকের আদর্শরূপেও 'নীলদর্পণ' পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের বিষাদান্ত সামাজিক নাটকে

Scanned with CamScanner

'নীলদর্পণ'-এর প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মৃত্যু দৃশ্যের আধিক্য, করুণরসের আতিশয্য, প্রতিবাদহীন দুঃখভোগ প্রভৃতি যে যে করুণরসাত্মক লক্ষণ এই নাটকের মধ্যে বিদ্যমান সেগুলি বহুলাংশে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি পরবর্তী প্রসিদ্ধ নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নাট্যশালার ইতিহাসেও 'নীলদর্পণ'-এর মূল্য কম নয়। এই 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের মধ্য দিয়াই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নাটকের অভিনয় দেশের মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি ও সহানুভূতি রঙ্গালয়ের প্রতি জাগরূক করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং রঙ্গালয়ের গৌরব ও জনপ্রিয়তার মূলে এই অসাধারণ নাটকখানির অবদান যে অনেকখানি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বহু পুরাতন জনপ্রিয় নাটক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার দিনেও যে নূতন করিয়া 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের আয়োজন দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় সমসাময়িক কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিত্যকালের সাহিত্য দরবারে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

গোলোক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মূল কাহিনীর সহিত সম্পৃক্ত আর একটি উপকাহিনী সাধুচরণের পরিবারকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই উভয় পরিবার একই অত্যাচারে সর্বস্ব হারাইয়া নিদারুণ শোকাবহ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সাদৃশ্য অথবা Parallelism রহিয়াছে। এই দুইটি কাহিনীর চরিত্রগুলির সহিত নীলকর সাহেবদের সংঘাত বাধিয়াছে এবং এই সংঘাতে সহায়তা করিয়াছে গোপীনাথ ও পদী ময়রাণী। 'নীলদর্পণ'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সংহতি ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের অনুচিত অবতারণা দ্বারা ইহার ঘটনাপ্রবাহ কোথাও তির্যক কি তরল করা হয় নাই। স্বল্পকালের পরিসরের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু সীমায়িত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে এক ঘনগম্ভীর ভাবচতনা প্রাণময় রূপ লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্যের মধ্যে উত্তেজনামূলক চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার তাঁহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে রাইয়তদের দুঃখভোগ, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা এবং নবীনমাধব ও তোরাপের দ্বারা তাহার উদ্ধার প্রভৃতি দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল যেখানে যেখানে আদিরসাত্মক ও করুণরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে সে-সব জায়গায় কাহিনীর গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যকারের সহানুভূতি ও আত্মময়তা যেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই তাঁহার আর্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এক ধনী গৃহস্থ পরিবার ও আর এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সহিত দুর্বৃত্ত নীলকরদের সংঘর্ষের সূচনাতে নাটকের আরম্ভ এবং সেই সংঘর্ষের শোচনীয় পরিণতিতে নাটকের উপসংহার। প্রথম অঙ্কে সংঘর্ষের আভাস—গোলোক বসু চিন্তিত, সাধুচরণ বিব্রত, তাহাদের সুখী পরিবার আসন্ন দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের সূচনা—গোলোক বসুকে কারাবদ্ধ করিবার জন্য নীলকরদের গোপন ষড়যন্ত্র। তৃতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের চূড়ান্ত অবস্থা—প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবীনমাধব নীলকরদের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত গোলোক বসুর কারাবাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগসাহেবের অত্যাচার। চতুর্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি—গোলোক বসুর আত্মহত্যা, সর্বনাশের মুখে গোলোক বসুর পরিবার। পঞ্চম অঙ্কে সর্বনাশের গর্ভে গোলোক ও সাধুর পরিবার, সর্বগ্রাসী দুর্ভাগ্যের অতি নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা।

Scanned with CamScanner

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার অনবদ্য সমালোচনার মধ্যে বলিয়াছেন যে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি—এই দুইটি গুণের ফলে তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি এত বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অনেকাংশ সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। শুধু কেবল অভিজ্ঞতা নহে, সহানুভূতি নহে, চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্ট কলাকৌশল অবলম্বন না করিলে কোনো চরিত্রই যথার্থভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। এই কলাকৌশলের একদিকে সংযম আর একদিকে আবেগ। নাটকীয় চরিত্রের ভাব ও আচরণ যেমন একটি পরিমিত স্বাভাবিকতার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে হয় তেমনি আবার আবেগ ও দ্বন্দ্ব সঞ্চার করিয়া তাহাকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিতে হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকের কোনো কোনো চরিত্র যে সরল ও জীবন্ত হইয়াছে আবার কোনো কোনো চরিত্র যে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই কলাকৌশলের সার্থকতা ও ব্যর্থতা। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, গোপীনাথ প্রভৃতি যে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, —তাহাদের হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবলরূপে দেখান হইয়াছে, তেমনি আবার তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গি অতি স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত হইয়াছে। নীলমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র যে নির্জীব ও নীরস হইয়াছে তাহার কারণ দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার অভাব নহে, সহানুভূতির স্বল্পতাও নহে। তাহাদের চরিত্র বেশী ভালো বানাইতে যাইয়াই নাট্যকার তাহাদিগকে মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাদের মুখের ভাষার তোড়ে হৃদয়ের ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে। হৃদয়বৃত্তির কোনো প্রবল সংঘাত তাহাদের মধ্যে নাই, ক্রিয়া অপেক্ষা কথাদ্বারাই তাহারা আমাদের সহানুভূতি অধিক আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে। এই সব কারণেই তাহাদের চরিত্র সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। সংলাপের শুধু দীর্ঘতা নহে, ইহার অসংগত অস্বাভাবিকতার ফলেও ভদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রগুলি এরূপ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের চরিত্র প্রাণ লাভ করে তাহার সংলাপ হইতে, সেই সংলাপ যেখানে অবান্তর সেখানে চরিত্র কখনো বাস্তব হইতে পারে না। প্রণয়ে কিংবা প্রলাপে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় না, তাহা আহৃত হইয়াছে সংস্কৃত নাটক হইতে। সেজন্য তাহাদের কথা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, তাহাদের মূর্তিও আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিকৃতমস্তিষ্কা মাতার হাতে নিজের স্ত্রীর মৃত্যু দেখিয়া বিন্দুমাধব বলিতেছে, 'আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত; শোকশার্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।' বিন্দুমাধবের এই কথাগুলি নিদারুণ শোকাবহ অবস্থাতেও যে আমাদের অন্তর নাড়া দেয় না তাহার কারণ নিতান্ত কৃত্রিম সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ছাড়া আর কিছুই নহে, খাঁটি বাংলা ভাষায় ব্যক্ত হইলে কথাগুলি আমাদের চিত্তে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করিত। সুস্থ ও সভ্যশ্রেণীর ভাষার এই কৃত্রিমতার কারণ সম্ভবত এই যে, দীনবন্ধু তৎকালীন প্রচলিত ভাষাদর্শের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য, —'মনে হয়, সাধুভাষার সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তৎকালীন হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও গম্ভীর রসাত্মক নাটকের ভাষা সম্পূর্ণ দুই রকম ছিল। প্রহসনের ভাষা যেমন সচল ও স্বাভাবিক; নাটকের ভাষা তেমনি অচল ও অস্বাভাবিক ছিল।'

Scanned with CamScanner

রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' অথবা 'উভয়-সঙ্কট' এর ভাষার সহিত 'নবনাটক'-এর ভাষার প্রভেদ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অথবা 'জামাইবারিক'-এর সহিত 'লীলাবতী' অথবা 'নবীন তপস্বিনী'-র তুলনা করিলেও ভাষার গুণে তাঁহার প্রহসনের চরিত্রগুলি কত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। নাটকের মধ্যেও তিনি যেখানে লঘু হাস্যরসের অবতারণার সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রাণরসের প্রতিমূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন; নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, জলধর, জগদম্বা প্রভৃতি চরিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নীলদর্পণ'-এও প্রধানত এই ভাষার একান্ত সজীব স্বাভাবিকতার জন্য আদুরী, গোপীনাথ, তোরাপ, রাইচরণ, পদী, রোগ, উড ও রাইয়তগণের চরিত্র এত সরস হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র নিতান্ত নীরস হইয়া পড়িয়াছে। নবীনমাধব নাটকের নায়ক। এই উদার নির্ভীক ও মহাপ্রাণযুক্ত যুবক দুর্দান্ত নীলকর সাহেবদের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। সুতরাং তাহার চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, সুঅঙ্কিত হইলে ইহা আমাদের মনে অবিস্মরণীয় প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারিত, কিন্তু এই ভাষার কৃত্রিম কাঠিন্যের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবার সময় অথবা নীলকর সাহেবদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার অবস্থায় তাঁহার ভাষার আড়ম্বরে অন্তরের কোন প্রবল আবেগ ও প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

'নীলদর্পণ'-এ দরিদ্র কৃষক নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষক এবং আদুরীর মত ঝি আর কোথাও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না। শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু তাহাদের প্রাণের বন্ধু হইয়া নিজেকে তাহাদের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের উন্মুক্ত অমার্জিত জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও ভঙ্গি তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। তোরাপ সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র কৃষক কিন্তু দুর্দান্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাহার ভয় নাই, জীবন সম্বন্ধে তাহার একেবারেই কোনো পরোয়া নাই। সুনিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে একবার ক্ষেত্রমণি ও আর একবার নবীনমাধবকে উদ্ধার করিয়াছে। তাহার হাত গিয়াছে কিন্তু দাঁতের দ্বারা সে প্রতিশোধ লইয়াছে। নবীনমাধবের ন্যায় সে শিক্ষিত ও উদার নহে, ক্ষমার মহিমা সে জানে না, আবেদনের কোনো মূল্য তাহার কাছে নাই, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত আর চোখের বদলে চোখ। কিন্তু তাহার এই ক্রুদ্ধ হিংস্র প্রতিহিংসার নীচে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম-নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম প্রভুভক্তি আর স্নেহসিক্ত মনুষ্যপ্রীতি। সাধুচরণ ও রাইচরণ এই দুই ভাইএর মধ্যে রাইচরণের চরিত্রই অধিকতর সজীব হইয়াছে। তাহার কারণ সাধুচরণ একটু হিসাবী, সাবধানী সহিষ্ণু ও আপসপন্থী, তাহার কথাবার্তা একটু আড়ষ্ট ও ভদ্রঘেঁষা, কিন্তু রাইচরণ খাঁটি চাষা— গোঁয়ার, বেপরোয়া ও চিন্তাভাবনাহীন। তাহার পেটের জ্বালার কাছে বিষয়ের চিন্তা তুচ্ছ, পদী ময়রাণী মেয়েলোক হইলেও দামঠাসা করিতে তাহার দ্বিধা নাই। আদুরীচরিত্র নাট্যকারের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আদুরী ঝি হইলেও নাটকের মধ্যে সে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং নাটকের বিষাদ-ঘন পরিবেশের মধ্যে সে এক সরস কৌতুকের ধারা সঞ্চার করিয়াছে। নাটকের স্ত্রী-মহল জমাইয়া রাখিয়াছে সে—তাহার রসাল ছড়া আর শাঁসাল মন্তব্যের মধ্য দিয়া। সে সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল, সব ব্যাপারে সে একটি মত

Scanned with CamScanner

প্রকাশ করিয়া ছাড়িবে। নাড়ের বিয়ে দেয় যে সাগর সে যে তাহার দলে নয়, দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়িলে সে যে কখনই সাহেবের কাছে যাইবে না, কুটির বিবির মাচেরটক সাহেবের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যে সে মোটেই সমর্থন করে না—ইত্যাকার বিবিধ মন্তব্য দ্বারা সে সকলের মাঝে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করিয়া বসে। কিন্তু আদুরীর আর একটি দিক আছে—প্রভুপরিবারের সকলের সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ, তাহাদের দুঃখবেদনার সহিত তাহার একান্ত একাত্মতা।

দীনবন্ধুর সহানুভূতি আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।" এই সর্বব্যাপী সহানুভূতির ফলেই তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক—শেক্সপীয়র, ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্রের সহিত একই পংক্তিতে তিনি অধিষ্ঠিত। পুণ্যবানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আছে কিন্তু পাপীর প্রতিও তাঁহার ঘৃণা নাই। সেজন্য গোপীনাথ ও পদীময়রাণীর চরিত্রও তিনি সহানুভূতির সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গোপীনাথ নীলকর পদলেহী, নীচ স্বার্থপর ভৃত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন একটি বেদনাকরুণ, আত্মসচেতন ধিক্কারবোধ আছে যাহাতে তাহার প্রতি আমরা একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য সমবেদনা বোধ করিয়া থাকি। শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ-চরিত্রের ন্যায় দীনবন্ধু একটি নীচ ঘৃণ্য চরিত্রকে সরস-রহস্যপ্রিয় উপভোগ্য চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। পদী ময়রাণীও একটি নষ্টচরিত্রা কুটনী হইয়াও যে একেবারে নির্লজ্জ হৃদয়হীন হইয়া পড়ে নাই, নাট্যকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। সকলের ঘৃণা ও পরিহাস কুড়াইয়া সে নিজের কলঙ্কিত মুখটি সমাজের দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়াই রাখিতে চাহে। নবীনমাধবকে দেখিয়া সে লজ্জায় ধিক্কারে বলিয়াছে, 'ও, মা, কি লজ্জা, বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।' ক্ষেত্রমণিকে সে রোগ সাহেবের কাছে ভুলাইয়া আনিয়াছে বটে কিন্তু এই নরপিশাচের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেও সে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের কাজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। সে নিজেই বলিয়াছে, 'আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবের ধরে আপন পায় আপনি কুড়ুল মারি?... আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই?'

'নীলদর্পণ' নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। এই উদ্দেশ্য নাট্যকার প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই। নাটকের ভূমিকায় এবং নাটকীয় চরিত্রের কথায় অত্যাচার-পীড়িত কৃষকদের দরদী মুখপাত্র নিজেকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে নাটকের শিল্প ও রসপরিণতিও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিরুপায় কৃষককুলের নিদারুণ সমস্যাটি সকলের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই নাট্যকার তাঁহার নাটকে সর্বব্যাপী করুণ রসের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' করুণ রসাত্মক নাটক সন্দেহ নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহার মধ্যে ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব সব কিছুই দেখান যাইতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র করুণ রসাত্মক বলিয়া 'নীলদর্পণ'-এর বিচার শেষ করা চলে না। 'নীলদর্পণ' পাশ্চাত্ত্য প্রভাবাশ্রিত পঞ্চাঙ্ক নাটক সুতরাং পাশ্চাত্ত্য নাট্যলক্ষণ অনুসরণ করিয়া ইহা বিষাদান্তক হইলেও যথার্থ ট্র্যাজেডি হইয়াছে কিনা সেই বিচার অবশ্যই সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। নাটক বিষাদান্তক হইলেই ট্র্যাজেডি হয় না। যে বিষাদ শুধু কেবল বাহ্য ঘটনা ও শক্তি দ্বারা উদ্দীপিত, যে বিষাদ চরিত্রের কোনো দুর্বার চিত্তবৃত্তি অথবা দুর্লঙ্ঘ্য আচরণ দ্বারা উদ্রিক্ত হয় নাই তাহা ট্র্যাজেডির অন্তর্ভুক্ত নহে। মানুষ

Scanned with CamScanner

নিষ্ঠুর ভাগ্যের সহিত দুর্দান্ত সংগ্রাম করিয়া যখন পরাজিত, সে তাহারই দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের নিদারুণ দ্বন্দ্বে যখন ক্ষতবিক্ষত তখনই তো তাহার ট্র্যাজেডি। কিন্তু সেই ট্র্যাজেডি 'নীলদর্পণ'-এ নাই। এই নাটকে দুঃখ আছে, আঘাত আছে, কিন্তু সেই দুঃখ ও আঘাতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ কোথায়? নিছক দুঃখ-ভোগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাই, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মধ্যেও কোনো ট্র্যাজিক মহিমা নাই। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, 'Tragedy is an imitation of action and primarily on that account, of persons acting' । কিন্তু নীলদর্পণ' এর বিয়োগান্তক চিরত্রগুলির মধ্যে এই সচল, সক্রিয় ভাব আমরা দেখি না। স্বরপুর-বৃকোদর নবীনমাধবের বলবীর্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রমণির উদ্ধারদৃশ্য ব্যতীত আর কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই। অ্যারিস্টটল আর একটি অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন— 'Now, Persons possess certain qualities in virtue of their characters but are happy or the reverse in virtue of their actions' । কিন্তু নাটকে গোলোক, নবীনমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতির করুণ পরিণতি তাহাদের কোনো আচরিত কর্মের ফলে হয় নাই। তাহারা বাহিরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে নীরব আত্মাহুতি দিল। ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এই দুঃখ বিশ্ববিধানের কোনো নিগূঢ়, অনির্দেশ্য রহস্যবেদনা আমাদের মনে জাগ্রত করে না। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন, 'প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে।' কিন্তু তাহাও বোধ হয় ঠিক নহে। গ্রীক নাটকে যে মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে সেই রকম কোনো ভ্রান্তিও এই নাটকে নাই। এখানে দুঃখের কোনো কারণ, কোনো দায়িত্ব নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত নাই; সেজন্য এই দুঃখ তাহাকে করুণ করিয়াছে কিন্তু জীবন্ত করিতে পারে নাই। নাটকের মধ্যে যে সর্বব্যাপী বিষাদময়তা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাও অতিকথন ও আতিশয্যদোষে সংহতগম্ভীর রূপ হারাইয়া যেন ফেন-তরল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের রুদ্রজ্বালার তপ্ত নিশ্বাসে অশ্রুবাষ্প শুকাইয়া যায়, বাক্যপ্রবাহ সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া এক নির্বাক অন্তর্বেদনায় গুমরিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এই নাটকে অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে, বাক্যের বন্যা বহিয়াছে দুঃখের জ্বালা-বেদনা ইহাতে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে মৃত্যুর অসঙ্গত আতিশয্য দেখিয়া মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মুছিয়া যায়। যেখানে মৃত্যু এত সুলভ, এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের মনে দুঃখ উদ্রেক করে না, আতঙ্কও সঞ্চার করে না। শ্মশান-দৃশ্যে মৃত্যুর শোভাযাত্রা দেখিয়া আমরা বিচলিত হই না, অথচ কোন কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমরা কাঁদিয়া ব্যাকুল হই। এই নাটকেও মৃত্যু শুধু ঘটানো হইয়াছে মাত্র; ইহাকে শিল্পরসের অঙ্গীভূত করা হয় নাই। সেইজন ইহা আমাদের চোখের দৃষ্টিতে শেষ হইয়া যায়, মনের মর্ম পর্যন্ত আর পৌঁছিতে পারে না।

Scanned with CamScanner